বিভা

জীবনানন্দ দাশ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

বিভার মুখের লাবণ্য বেশ উচ্চজাতীয়। সচরাচর এ রকম সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। খুব অবর্ণনীয় সৌন্দর্য নয়—কিন্তু এর বিশেষ ধরনটা আমার কাছে বড্ড চিত্তাকর্ষক।

অনেক নারীই তো দেখেছি, কিন্তু একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে, যার মুখ অনেকটা এই বিভার মতো। সেই মেয়েটি ষোলো-সতেরো বছরে মারা যায়, মৃত্যু বড়ো করুন। তার মৃত্যুর পর আমার মনে হয়েছিল যুবাবয়সের সৌন্দর্যের একটা বিশেষ বিকাশ পৃথিবীর থেকে মুছেই গেল বুঝিবা।

তারপর এই বিভাকে দেখলাম! মনে পড়ে প্রায় সাত বছর আগে বায়োস্কোপে (চার আনার সিটে) বসে রুথ চ্যাটার টমকে দেখেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে গঙ্গাসাগরের মেলা দেখতে গিয়ে মৃত সেই পাড়াগাঁর মেয়েটি, বিভা, আর রুথ, এই তিনজনের মুখে একই আদল লেগে রয়েছে যেন। একটা ছিপছিপে নিমীলিত চাঁপাফুল, কিংবা শীর্ণ একটা উন্মুখ চাঁপার কলির মতো নারীর আঙুলের দিকে তাকালে এ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারা যায় যেন।

একদিন সকালবেলা খুব দেরিতে ঘুমের থেকে উঠে দেখলাম বিভা তার সোফার সামনে একটা তেপয়ের ওপর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে।

আমার দিকে ঠিক পেছন ফিরে বসেনি। একটু তেরছা হয়ে ঘুরে বসেছে। আমি যে আমার ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, এ তার চোখে পড়েও যেতে পারে।

কিন্তু এদিকে সে তাকাচ্ছে না। তাকালেও আমি যে এসে দাঁড়িয়েছি, এতে তার বিশেষ কিছু এসে যেত না। সে যেমন খাচ্ছে, তেমনি নিজের মনে নিশ্চিন্তে সে চা খেয়ে যেত। আমার সম্বন্ধে হয়তো ভাবত এইটুকু যে নিজেরই জানালার কাছে এসে দাঁড়াবার অধিকার এ ভদ্রলোকের আছে, তা সে দাঁড়াক, রহস্যের বিশেষ কিছু নেই এ ঘরের ভেতর। যদিও-বা থাকে তো আমি নারীই হয়তো সেই রহস্য কৌতুকের জিনিস।

এইটুকু ভেবে সে হয়তো আড়চোখে একবার ফিরে তাকাত। কিন্তু তক্ষুনি দেখতে পেত যে আমি জানালার থেকে সরে গেছি। আমিই বরং আগে জানালা বন্ধ করব—বিভা নয়। আমিই বরং আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাব। কিন্তু মেসের জানালার থেকে (একদৃষ্টে) বিভার দিকে তাকাচ্ছি বলে সে যে তার ঘর থেকে উঠে চলে যাবে, এ রকম স্থূলতা যেন আমাদের দুজনার ভেতর না থাকে। আশা করি তাকাবে না। কিন্তু আশা বা স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব নিয়েই আমাদের ঢের বেশি কাজ। কাজেই বিভা যতক্ষণ না বোঝে যে জানালার কাছে আমি ডেকচেয়ারে বসে আছি—ততক্ষণই নিরাপদ। ভাবি, দেখে, কল্পনা করি। চুরুট জ্বালাই—বেশ কাটে সময় আমার। তারপর হঠাৎ দেখি সে সোফার থেকে উঠে দাঁড়াল, কিংবা কাগজ ছিঁড়ছে বা চুলের ভেতর দিয়ে চিরুনিটা টেনে টেনে একগোছা ঝরা চুল হাতে নিয়ে পশ্চিমের জানালার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি আমি। মেসের বারান্দায় চলে যাই। নিরিবিলি আমার জানালাটার মুখোমুখি তার নিজের পশ্চিমের জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কী করে যেন ভাবে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

এই সব আমার কাছে রহস্য। কিছু টের পাই না আমি। কিন্তু খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি তা না টের পাওয়াই ভালো।

একদিন দেখলাম আমার জানালার রেলিংয়ে কতকগুলো চুল উড়ে এসে লেগে রয়েছে। ধীরে ধীরে গোছাটা তুললাম। বিভার চুল নিশ্চয়ই। রেশমের ডিমের মতো যেন একটা, রোদের ভেতর দেখায় সোনালি। ছায়ায় কালো। শীতের বাতাসে কেমন ভীরু নিঃসহায়তাকে গড়তে থাকে। কেমন একটা করুণ গন্ধ চারদিকে যেন জমতে থাকে তার। গঙ্গাসাগরের মেলা দেখতে গিয়ে সেই মৃত মেয়েটির মুখখানা মনে পড়ে যায় আমার।

একা বসে থেকে উত্তরের দরজার দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভাবি আমি। তারপর হঠাৎ তাকিয়ে দেখি চুলের গুটিটাকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি।

এমনি করেই হারিয়ে যায়।

ক্ষোভ হয় একটু সাবধানে রাখলে পারতাম না?

কিন্তু হতোই-বা কী রেখে? বড়জোর বিভার মাথার কয়েক গোছা চুল তো! মানুষের পায়ের নখ বা মাথার চুলে বা পরনের শাড়ি সিঁদুরের কৌটা বা চিঠি শ্রদ্ধা করে ভালোবাসায় জমিয়ে রাখবার একটা সময় ছিল অবিশ্যি আমার জীবনে। কিন্তু সে সময় এখন আর নেই। একটা কথা ভেবে ভারি কৌতুক বোধ হয়। বিভার চুল তো? না, তার মায়ের না, পায়রাগুলো কার চুল কোত্থেকে এনে ফেলেছে?

শেষ পর্যন্ত চুল নিয়ে আমাদের জীবনের কারবার নয়। তুচ্ছ একগোছা চুলের মতো জিনিস মাঝে মাঝে উড়ে এসে আমাদের হৃদয়টাকে পরিমাপ করে যায়? এই অব্দি—আর কিছু নয়।

স্লিপারসুদ্ধ ডান পা'টা তুলে বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর রাখি। তাকিয়ে দেখি চুলের গুটিটা এতক্ষণ স্লিপারের নিচে পড়ে ছিল। থাক। উড়িয়ে দিই। জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে উড়ে একেবারে একতলার নর্দমার ভেতর পড়ে গিয়ে।

বিভা চা খাচ্ছিল। সঙ্গে একটা টোস্ট আর গোটা দুই ডিম খেলে।

এক পেয়ালা চা ফুরিয়ে গেছে। টিপয়ের থেকে আর এক পেয়ালা আন্দাজ ঢেলে বিভা চিনি-দুধ মিশিয়ে নিচ্ছিল। এমন সময় একজন বুড়োমতন ভদ্রলোক দুটো খাঁচা নিয়ে ঢুকলেন।

ছোটো খাঁচায় একটা ময়না। বড়ো খাঁচায় বেশ রংচঙা একটা কাকাতুয়া। বিভা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে চমকে বললে—'বা!'

চায়ের পেয়ালাটা তেপয়ের ওপর রেখে দিল সে।

বুড়ো বললে—'খান খান, আপনি চা খান।'

না, চা সে খেল না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'এ পাখি কোথায় পেলেন?'

—'আমি কিনে এনেছি।'

—'কোত্থেকে?'

—'ও সেই টেরিটি বাজার'—

—'তা, ভারি সুন্দর পাখি তো—আপনি পুষবেন বুঝি?'

বুড়ো চোখ কপালে তুলে বললে—'আরে বাপ রে! আমি পুষব পাখি!' একটু কেশে বললে—'এই যে দেখছেন ময়না, ইনি হচ্ছেন রানিমা।'

—'রানিমা? কোথাকার?'

—'আর এই যে দেখছেন কাকাতুয়া, ইনি হচ্ছেন চীনের রাজা।'

বিভা হাসছিল।

বুড়ো বললে—'ছ-সাত শ বছর রাজা হয়েছে—এখন দেশ বেড়াবার সময়।'

—'তাহলে পাখিগুলো বুড়ো?'

—'একটুও না। এদের সাত হাজার বছর পরমায়ু।'

—'বিক্রি করবেন?'

—'চীনের রাজাকে বিক্রি!'

বুড়ো খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। বললে,—'কিন্তু এদের কপালে কর্মভোগ আছে। না হলে টেরিটি বাজারে এসে জোটে?'

খানিকক্ষণ হেসে বুড়ো বললে—'কিন্তু যার-তার কাছে মাল ছাড়ি না। পথে এমন বিশ-পঁচিশ হাজার লোক শুধিয়েছে আমাকে! ধেতরি তার! তাদের কাছে বেচব এই জিনিস? হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে কত রঙ্গই হবে। পাখি চোখে দেখেছে কোনো দিন তারা?' একটু হেসে বললে—'সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি।'

বিভা উৎসুক হয়ে বললে—'তা, বাবার কাছে যান না।'

—'তিনি রাখতে চান না।'

—'কী বললেন?'

—'আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'

—'এই কাকাতুয়াটার কত দাম?'

—'আপনাকে খুব সস্তায় দেব।'

বিভা বুড়োর দিকে তাকালে।

—'এই চীনের রাজাও আপনার কাছে থাকতে চায়।'

—'আমার কাছে?'

—'খুব।' বললে—'আপনি যদিও ইরানের রানি'—একটু কেশে বললে—'কিন্তু সেকালে চীনে ইরানে বিয়ে চলত। এক-একজন জাপানি মেয়ে দেখেছেন বেশ লম্বা ছাঁদের মুখ—নাক টিকলো—সেই সব বিবাহের সন্তান।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে ছিল। মুখ তুলে বললে—'আপনি মুসলমান?'

—'হ্যাঁ, মা।'

—'কলকাতায়ই বরাবর?'

—'না, মা, কলকাতায় আমি এই টেরিটি বাজারের সম্পর্কে। সিঙ্গাপুরে কত জায়গায় ঘুরি।'

—'সিঙ্গাপুরে কী?'

—'সেইখানেই তো পাখি। এই তো উজাড় করে ময়না ধরে নিয়ে এলাম।'

—'আপনি?'

—'হ্যাঁ। সেই সিঙ্গাপুর থেকে।'

—'পাখি ধরেন কেন?'

—'চেনা ব্যবসা। বড্ড ফিটফাট। তবে আগে যে রকম সুবিধা ছিল, এখন আর তা নেই। পাখি মরেও-বা কত।'

—'কিসে মরে?'

—'জাহাজে না চড়তেই ঝুর ঝুর করে মরে যায়। চড়লে তো কথাই নেই। যে কটাও-বা বাঁচে টেরিটি বাজারে সাফ করতে গিয়ে দেখি ঠ্যাং উঁচু করে হাঁ করে পড়ে আছে।

—'মরে?'

—'মরে কেলিয়ে।'

—'ছ!'

—'তবে আপনার চামড়ার কারবার থেকে ঢের ভালো।'

—'সে আবার কী রকম?'

—'আস্ত আস্ত গোসাপ ধরে চামড়া খসিয়ে নেওয়া হয়ই—'

—'আস্ত আস্ত?'

—'তো আপনি জানেন না বুঝি? সে দেখলে বড়ো দুঃখ হয়। জ্যান্ত গোসাপটাকে—প্রাণের ভিতর কৃষ্ণ ছিল বাঁশি বাজাত'—একটু কেশে বললে—'হি হি!' খানিকটা শিকনি ঝেড়ে নিয়ে বললে—'কিন্তু জীবনটা এই রকমই। শুধু গোসাপের বলেই তো নয়। গোসাপের, টিকটিকির, কুমিরের, ঢোঁড়া, গোখুরো, দুধরাজ, পাঙরাজ, আপনার গিয়ে উট, গোরু, মানুষ, ছাগল। আমাদের মানুষের পিঠের চামড়া নিয়েও মানুষে কত ডুগডুগি বাজায়, মা। আমাদের জীবনের কথা ভাবতে গেলে, দুর্নীতির আর শেষ নেই, মা।'

—'এ কাকাতুয়াটার দাম কত বললে?'

—'ব্যবসা আমাদের বেশ দয়ামায়ার, কিসে পাখিটা বাঁচে, সেই দিকেই হচ্ছে আমাদের নজর। কৃষ্ণকে আমরা মারতে চাই না। তিনি থাকুন। তাকে তেল দেই, জল দেই, বাঁশি দেই।' ময়নার দিকে ফিরে—'বল তো ময়না রাধে প্রাণেশ্বরী!'

—'রাধে প্রাণেশ্বরী।'

—'দেখলেন—দেখলেন তো বাঁশি কেমন বাজে।'

বাঁশি শুনে বিভা বিশেষ সুখী হলো না।

মুসলমান ভদ্রলোকটি বুঝলেন, বললেন—'সব রকম বুলি করতে পারে—হেলো।'

—'হেলো।'

— 'Kissing sweet heart.'

— 'Kissing sweet heart.'

— 'Idiot! To bother a girl like that.'

— 'Idiot! To bother a girl like that.'

বিভা হেসে উঠল।

— 'You Northumberland rascal.'

— 'You Northumberland rascal.'

—'বড়সাহেব তো আতা হ্যায়।'

—'মেরা দিল ঘাবড়াতা হ্যায়।'

—'দেখলেন, না বলতে কতখানি বলে ফেলল।'

ময়নাটার দিকে তাকিয়ে,—এই চীনেটাকে ডাক তো—ডাক—হেলো।'

—'হেলো।'

—'তারপর? হেলো।'

—'হেলো।'

—'হেলো বয়!'

—'হেলো বয়!'

—'দেখলেন তো মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলে।'

—'এত কথা কোত্থেকে শিখলে!'

—'কেষ্টধন শেখাই? এর খাঁচায় কী আর থাকে, মা। খাঁচায় খাঁচায় ঘোরে।'

বললে—'একটা গোরা রেখেছিল কদ্দিন। যেই বিলেতের দিকে উড়াল দিলে ওমনি পাখিটাকে গেল ফেলে।' একটু কেশে বললে—'তারপর ছিল একটা চোরের আড্ডায়—' বললে, 'সেখান থেকে এক মাদ্রাজি বাবুর্চি মুসলমান বাটপাড়ি করে নিয়ে যায়। চোর কি মুসলমান জেতের ভিতরেও নেই? তা আছে।' মাথা নেড়ে বললে—'তা সেটা মাদ্রাজি—চেট্টির থেকে মুসলমান হয়েছে। খাঁটি আরবি মুসলমান চুরিও করে না, গোলামিও করে না, ও ভারি কায়দার জাত। একেবারে পয়গম্বরের নিজের জিনিস কিনা।' হাত ঘুরিয়ে বললে—'এটা ছিল চেট্টি—চুরি করে মরে, তার জন্য এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়ি এল, সেখানে একটি বিধবা এই ময়নাটাকে কিনল।'

—'একটি বাঙালি বিধবা?'

—'হাঁ, তার কাছ থেকেই এই রাধা বুলি শিখেছে। রাধাকৃষ্ণ। আপনার গিয়ে এক শ আট নাম—তারপর মানভঞ্জন—নিমাই সন্ন্যাস—'

—'এত সব?'

—'সব শিখেছে। পড়িয়েই দেখুন না।'

—'থাক এখন, পরে হবে।'

—'আমার মনে হয় বিধবা ঠাকরুনের কাছে থেকে থেকে পাখিটা জাতে উঠেছে।'

—'এর আগের জাত?'

—'হ্যাঁ, ময়না তো হিন্দুই।'

—'হিন্দু?'

—'হিন্দু বৈকি। হিন্দু শুধু নয়—বোষ্টম। ময়নার জাতধর্ম হয়েছে রাধা কিষ্টো বুলি শেখা।'

একটু হেসে বললে—'সে একটা মজা দেখছেন কি—'ময়নার জীবনে ভারি একটা মজা আছে!—জন্মায় তো সিঙ্গাপুরে। তারপর আপনার সিঙ্গাপুরেই পেনাঙি, চেট্টি, গোরা, মগ, তুর্কমান, ইহুদি, মেড়ো, সব ঘুরে তারপর বাঙালি বোষ্টমির কাছে আসবেই।'

বিভা চুপ করে ছিল।

—'এ একেবারে ধরাবাঁধা—এ আসতেই হবে।'

—'কেন?'

—'ধর্মচক্রের এই নিয়ম।'

বিভা একটু বিস্মিত হয়ে বললে—'আপনি মুসলমান?'

—'হ্যাঁ, মা।'

একটু থেমে বললে—'এই পাখিগুলো হচ্ছে জাতবোষ্টম। যৌবনে যতই গোলমাল করুক না কেন, গোশত-রুটি, মালাইকারি আর বর্মাই ভাপ্পি যতই খান না কেন, আখেরে মতিগতি স্থির হলে বোষ্টমের ঘরে আসবে। নাম শিখবে, নাকে রসকলি আঁকবে—মালপো খাবে—'

বিভা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললে—'আপনি আবার সিঙ্গাপুর যাবেন নাকি?'

—'হ্যা।'

—‘এই পাখি ধরতে?’

—‘হ্যাঁ।’

—‘কী করে ধরেন?’

—‘সে বড্ড মস্ত গল্প, সিঙ্গাপুরেই কি ধরি শুধু?’

—‘তবে?’

—‘ধরবার ঢের জায়গা আছে।’

—‘আপনাদের জালে আটকা পড়েই তো অনেক পাখি মারা যায়।’

—‘না, জালেই কি ধরে শুধু?’

—‘তবে?’

—‘ধরবার রকম আছে ঢের। এ তো আর পাখির চামড়া খসাবার জন্য পাখি ধরি না, মরবেই-বা কেন বলুন?’

—‘কিন্তু জাহাজে উঠে তো অনেক মরে।’

—‘সে যাদের কর্মভোগ আছে।’

—‘কর্মভোগ থাকে না।’

—‘তা থাকে।’

—‘কী রকম?’

—‘যারা পূর্বজন্মে পাপ করেছিল, সেসব পাখি সিঙ্গাপুরের জাহাজেই মরে যায়। মানুষ যেমন হাতজোড় করে প্রার্থনা করে না, তেমনি ঠ্যাং দুটো উঁচু করে ঠোঁটটা আকাশের দিকে ফিরিয়ে ভগবানের কাছে অপরাধের মাপ চায়। মাপ করেন, বোধ করি করেন না। সব কথা আমরা ভাবতে যাই না। সমুদ্রের ভেতর দেই টি করে

ছুড়ে ফেলে। হাঙরে সকরে খেয়ে ফেলে। হাঙরে সকরে খেয়ে ফেলে। তাই তো খায়। খায় না? না হলে যায় কোথায়, বলুন? সমুদ্রে নোনাজলে হেজে যায়? তা আশ্চর্য কী? নুনের যা ঝাঁজ! একটা ময়নাকে বোধ করি এক পাকে সালুন বানিয়ে ফেলতে পারে। এক-একটা টোঙা থাকে জাহাজে, মরা ময়নার মাংস খায়। সে চীনে বলুন আর গোরা বলুন আর মন রসুল আর মুসলমান বলুন, এই সব মরা ময়নার মাংস খায়। খায় তারা হারাম ছাড়া কী? জেতে যাই হোক, কাজে তারা টোঙা মুণ্ডাদের চেয়ে হারামি!'

—'সমুদ্রের ভেতর ফেলে দেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আহা।'

—'কী করব তাহলে?'

—'বেশ গাছে গাছে পাহাড়ে-খেতে তো চরত, খাঁচায় ভরবারই-বা দরকার ছিল কী?'

—'ও, আপনার হচ্ছে সেই হিসেব?'

বুড়ো একটু হেসে বললে—'কিন্তু বুনোর মতো বোকা হয়ে চরে বেড়ালেই তো হয় না—(খুব সুন্দর তো হয় তাহলে) রাধাকৃষ্ণ গান শিখতে হবে তো।'

—'না শিখবার এমনই-বা কী দরকার।'

—'বা বাংলাদেশে আসতে হবে না?'

—'কী হবে এ দেশে এসে?'

—'এ দেশটা হচ্ছে ময়নাদের ধর্মের আখড়া।'

—'আপনি তাই বলছেন।'